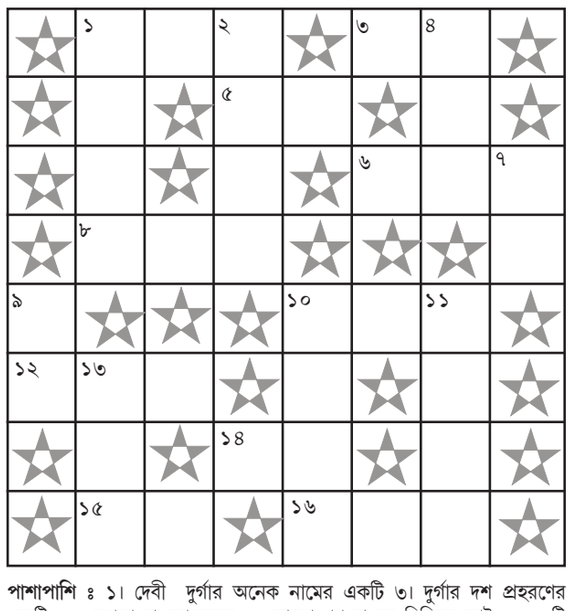

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার ২৫ আশ্বিন ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ১৪৬ সংখ্যা

গাফিলতি

এ দেশে যাত্রী পরিসেবায় রেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনও বহু প্রত্যন্ত অঞ্চল রেল সংযোগে না এলেও যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণের ভরসা রয়েছে রেলের পরিসেবাতেই। কিন্তু সেই ভরসা, সেই আস্থা মাঝেমধ্যেই জোর ধাক্কা খায়। তখন প্রশ্ন ওঠে। বহু আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে রেল সুরক্ষা। রেল যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে কতটা ভাবিত? রেল কি আদৌ যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায়? এ ব্যাপারে তারা কী করছে? এ ধরনের আলোচনায় বড়ো হয়ে দেখা দেয় রেল সুরক্ষার ঘাটতি প্রসঙ্গ। বুধবার সকালে রায়বেরিলির কাছে হরচন্দপুর স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময় লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে নয়াদিল্লিগামী নিউ ফরাক্কা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন সহ নয়টি বগি। ভয়াবহ দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক শিশু সহ সাতজনের। আহতের সংখ্যা বহু। কামরাগুলি একটি অপরটির উপর উঠে যাওয়ায় বেশ কিছু দেহ তাতে আটকে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। আহতের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের কিছু যাত্রী রয়েছেন, তবে মৃতদের অধিকাংশই বিহারের বাসিন্দা। এই ধরনের রেল দুর্ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই দুঃখবহ। আগে দেখা যেত, কোনো বড়ো রেল দুর্ঘটনা ঘটলে রেলমন্ত্রী পদত্যাগ করতেন। তাতে যে খুব একটা লাভ কিছু হত, তা নয়। হয়তো শুনতে ভালো লাগত, দায় স্বীকার করেছেন মন্ত্রী। কিন্তু সাধারণভাবে দেখলে এই ধরনের দুর্ঘটনার কারণ কখনও যান্ত্রিক, কখনও তা ঘটে কর্মীদের গাফিলতিতে। যান্ত্রিক ত্রুটিও খতিয়ে ভাবলে কর্মীদের গাফিলতিরই ফল। রেলে কর্মীসংখ্যা কম নয়, তাঁদের পরিচালনা করার জন্য পদস্থ অফিসারও কম নেই। তবে দুর্ভাগ্য, কাজে গাফিলতি তবু থেকে যাচ্ছে। রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজ একশো শতাংশ ত্রুটিহীন হবে, এমনটাই কাম্য। তার কারণ, প্রতিদিন রেলে চেপে দূরযাত্রায় যাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাঁদের সুরক্ষার ভার রয়েছে রেলের ছোটো–বড়ো কর্মীদের হাতেই। তাঁরা একটু ভুল করলে, কোনো কারণে তাঁদের কাজে সতর্কতার অভাব ঘটলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। রেলকর্মীদের মধ্যে এই সচেতনতা জাগ্রত করা না গেলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে না। বুধবার দিল্লিগামী নিউ ফরাক্কা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ কী? প্রাথমিক তদন্তে প্রশ্ন উঠেছে পয়েন্টসম্যান–এর ভূমিকা নিয়ে। বলা হচ্ছে, ঠিক সময়ে পয়েন্ট পরিবর্তন না হওয়ায় ট্রেনটি ভুল লাইনে যেতে গিয়ে লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ট্রেনটির আগে যে লোকাল ট্রেন হরচন্দপুর স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটি ঠিকভাবেই লুপ লাইনে পাঠানো হয়েছিল। নিউ ফরাক্কা এক্সপ্রেসের যাওয়ার কথা মেইন লাইন দিয়ে। রেলের বক্তব্য, লুপ লাইন থেকে মেইন লাইন অভিমুখ পালটানোর সময়েই হয়তো সমস্যা দেখা দেয়। যাই হোক, তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে দুর্ঘটনার কারণ আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারবে রেল। তবে তদন্তের স্বার্থে সাসপেন্ড করা হয়েছে হরচন্দপুর স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টারকে। প্রথমে এই দুর্ঘটনার পিছনে নাশকতা থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই আশঙ্কা খারিজ করে দেওয়া হয়। নাশকতার বদলে যান্ত্রিক ত্রুটি ও রেলকর্মীদের গাফিলতির বিষয়টিই সামনে এসেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে রেল সুরক্ষার ঘাটতি প্রসঙ্গ এড়ানো যাচ্ছে না এবং তা নিয়ে চর্চা আপাতত চলবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় রেলের সুনাম কম নয়। তবে মাঝেমধ্যে কর্মীদের কাজে গাফিলতি সামনে এলে সেই সুনাম ঔজ্জ্বল্য হারায়। কাজে গাফিলতির ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছে না ভারতীয় রেল। এ অবশ্যই দুর্ভাগ্যের। অথচ ভারতীয় রেলের গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনা হচ্ছে বুলেট ট্রেন। তবে তার আগে কর্মীদের নিজ কাজ সম্পর্কিত সতর্কতা বৃদ্ধিতে আরও জোর দিতে হবে।

অমৃতধারা

ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ও আরাম বিরাম ত্যাগ না করিলে দেশ–জাতি–সমাজ–সংঘ–সমিতি–প্রতিষ্ঠানের সেবা বা অন্য কোনো মহৎ কাজ করা যায় না। যেখানে স্বার্থ সেখানে পরমার্থ, আর যেখানে পরমার্থ সেখানে স্বার্থচিন্তার লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। স্বার্থ ও পরমার্থ পরস্পর বিরোধী, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

তুমি কাহাকেও দ্বেষ করিও না। তাহা হইলে তুমি কাহারও দ্বারা বিদ্বিষ্ট হইবে না। তুমি দ্বেষ না করিলেও যদি কেহ তোমাকে বিদ্বেষ করে তাহা হইলে তাহার বিচারের ভার স্বয়ং সর্বনিয়ন্তাই গ্রহণ করিবেন। অন্যের দুর্ব্যবহারের কথা ভাবিও না। নিজে যথাযথ ভাবে সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া যাও। অপরের ভিতর গুণ আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রশংসা, অনুশীলন ও অনুকরণ করিবে, আর নিজের ভিতরের দোষ–ত্রুটি–দুর্বলতা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার নিন্দা, পরিশোধন ও পরিবর্জনে যত্নশীল হইবে। ইহাই মনুষ্যত্বের পথ–মহত্ত্বের পথে জয়যাত্রার শুভ পদক্ষেপ।

কখনও কোনো কাজে সময়াভাবের দোহাই দিও না। যে কাজটি মনে ধরে না সেই কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ থাকে না, আর আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব যেখানে সেইখানেই সময়াভাবের অছিলা বা অজুহাত দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মন না বসার, গৃহস্থ নরনারীর সৎকাজ ও ধর্মাচরণে সময় না পাওয়ার কারণ এখানে। সুতরাং, সাবধান। এজগতে সময়াভাবের মতো মিথ্যা কথা আর কিছু হইতে পারে না।

–স্বামী আত্মানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২১২৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি ঃ ১। দেবী দুর্গার অনেক নামের একটি ৩। দুর্গার দশ প্রহরণের একটি ৫। মেখলা বা কোমরবন্ধ ৬। ষোলো পণ বা সব মিলিয়ে মোট ১২৮০টি ৮। কন্যাসন্তান, আত্মজা ১০। হিমালয়ের মেয়ে দেবী পার্বতী ১২। প্রবল ঝড়–ঝঞ্ঝা ১৪। ধর্মরাজ, মৃত্যুর দেবতা ১৫। দশ মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা ১৬। যা চিরকাল টেকে না, অস্থায়ী বা অনিত্য।

উপর–নীচ ঃ ১। অনুষ্ঠানে যাকে ডাকা হয়নি বা নিমন্ত্রণ করা হয়নি ২। গানে লাল ঝুঁটি যে পাখি বায়না ধরে ৪। দেবী দুর্গার বাহন ৭। মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক ৯। ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি ঋষি ১০। রূপকথার এক পাখি ১১। প্রাচীন আমলের জিনিসের সংগ্রহশালা ১৩। বাজারে দামের দিকে লক্ষ্য রেখে টাকা খাটানো।

সমাধান ■ ২১২৩

পাশাপাশি ঃ ১। বল্লব ৩। গুপ্তিপাড়া ৪। হুড়ুম ৫। সুরেশ্বরী ৭। বীজ ১০। নবি ১২। পোলাপান ১৪। শ্যামল ১৫। বীরভূম ১৬। কাজল।

উপর–নীচ ঃ ১। বড়দেবী ২। বহুলা ৩। গুমসুম ৬। শ্বসন ৮। জটিলা ৯। ঘনশ্যাম ১১। বিলাওল ১৩। অলকা।

অ্যাঞ্জেলা মার্কেল : যেন আধুনিক গ্রিমের রূপকথা

জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা নেমে গিয়েছে অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের। তবু তিনি বিজয়িনী। তাঁর উদ্বাস্তু নীতি জার্মানির জাতিগত দৃঢ়তা বদলে দেবে কিনা সেই আশঙ্কা প্রকাশিত হচ্ছে নানাভাবে। লিখেছেন **অতনু বিশ্বাস**।

১৯৮৯-এর নভেম্বরে বার্লিনের দেয়াল ভাঙতে যে সমস্ত তরুণ–তরুণী হাত লাগিয়েছিল, দরজা খোলার আওয়াজ তুলেছিল 'টোর আউফ!', তাদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলা মার্কেল নামে এক ৩৫ বছরের তরুণী ছিল বলে শোনা যায়নি। কিন্তু ভবিষ্যৎ দুনিয়ার কাছে মিলিত জার্মানির ম্যাসকট হিসেবে দেখা দিয়েছেন সেই মার্কেলই। কিংবা আরও বড়ো প্রেক্ষিতে বলতে গেলে, সংঘবদ্ধ ইউরোপের প্রতীক হিসেবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পেরিয়ে জার্মানি কিংবা ইউরোপের ইতিহাসে এতটা প্রভাবও হয়তো ফেলেননি অন্য কোনো রাষ্ট্রনেতা।

২০১৬-র শেষদিকে, হোয়াইট হাউসের জন্যে দৌড়ের সময় হিলারি ক্লিন্টন বলেছিলেন, 'আমার প্রিয় অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, ইউরোপের কঠিন সময়ে যিনি এক অসাধারণ, শক্তিশালী নেতা,... উদ্বাস্তু সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তাতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত।' সাহস বা দুঃসাহস যাই হোক না কেন, মার্কেলের এই উদ্বাস্তু নীতি নিয়ে কিন্তু বিস্তর কাটাছেঁড়া হবে ভবিষ্যৎ দুনিয়ায়। যদিও এর বড়োসড়ো দাম দিতে হয়েছে মার্কেলকে, গত জার্মান নির্বাচনে। অ্যাঞ্জেলা মার্কেল জিতেছেন ঠিকই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এতটা কম জনসমর্থন কখনও জোটেনি তাঁর মধ্য–দক্ষিণপন্থী দল 'ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন'–এর। জনপ্রিয় জার্মান দৈনিক 'বিল্ড' এই নির্বাচনের ফলাফলকে দেখেছে 'রাজনৈতিক ভূমিকম্প' হিসেবেই। সরকার গড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় জোটসঙ্গী খুঁজতেই হিমসিম অবস্থা হয়েছে মার্কেলের।

ইউরোপের প্রায় সকল রাষ্ট্রনেতা যখন সিরিয়ার উদ্বাস্তুদের ভয়ে অস্থির, সে সময়ে সিরিয়ান রিফিউজিদের জার্মানিতে আশ্রয় দিয়েছেন ইউরোপের সব চাইতে বড়ো অর্থনীতির অধীশ্বরী 'দ্য আয়রন চ্যান্সেলার' অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। কোয়ান্টাম রসায়নে তিনি ডক্টরেট। কিন্তু সমাজের রসায়ন বোধকরি আরও জটিল।

২০১৫–তে টাইম ম্যাগাজিনের 'পার্সন অব দ্য ইয়ার' হন মার্কেল; তিন দশকের মধ্যে প্রথম কোনো মহিলা হিসেবে। রিফিউজি নীতি তার একটা কারণ তো বটেই। 'ইউরোপ কীভাবে হাজার হাজার শরণার্থীকে জায়গা দেবে'––এর উত্তরে ছিল তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কিন্তু সহজ উদ্ধৃতি ––'আমরা মোকাবিলা করব।' কিন্তু মানবিকতা তো সে মুদ্রার এক পিঠ মাত্র। তাঁর শরণার্থী নীতির ফলেই জার্মানি জুড়ে আজ রিফিউজির বন্যা। সিরিয়ান, আফগান, ইরাকি। মার্কেল যতই একে জাতীয় কর্তব্য বলুন না কেন, মুদ্রার অন্য পিঠে তাই উদ্বাস্তুদের নিয়ে তীব্র আশঙ্কা, আর তা কিন্তু একেবারে অমূলক নাও হতে পারে। কয়েক দশকের মধ্যেই হয়তো বদলে যেতে পারে জার্মানির জনবিন্যাস, তার খ্রিস্টান চরিত্র, তার শ্বেতাঙ্গ বৈশিষ্ট্য, তার কথ্য ভাষা, তার খাদ্যাভ্যাস, তার সংস্কৃতি, এমনকি তার বহু শতাব্দী লালিত জাতিগত দৃঢ়তাও। আর তা যদি হয়, সেজন্যে মার্কেলের রিফিউজি নীতিই কিন্তু উঠবে ইতিহাসের কাঠগড়ায়। শুধু জার্মানিই বা কেন, ইউরোপের অবাধ সীমান্ত দিয়ে জনবিন্যাসের এই বদলানো রূপরেখা ছড়িয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক––ফ্রান্স, হল্যান্ড, গ্রিস, ইতালি, স্পেন, পোর্তুগালে, কোথায় নয়!

আর সেই সঙ্গে গত জার্মান নির্বাচনে প্রবল উত্থান ঘটেছে তীব্র উদ্বাস্তু–বিরোধী আর মুসলিম–বিরোধী অতি দক্ষিণপন্থী 'অলটারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ড' বা 'এএফডি' দলের। পোস্টারে, স্লোগানে 'বোরখা'–র বদলে 'বিকিনি'–কে হাতিয়ার করে। ২০১৫–তে মার্কেলের শরণার্থী নীতির ফলশ্রুতিতে মিলিয়নের উপর উদ্বাস্তুতে ভরে গিয়েছে জার্মানি, এএফডি–র নেতারা তখন মার্কেলকে বলেছেন 'বিশ্বাসঘাতক'। আজ ১৩ শতাংশ জনসমর্থন আর বুন্ডেস্টাগে ৯৪টি আসন নিয়ে তীব্রভাবে অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে 'এএফডি'। জার্মানির মানচিত্র ধরে যত পুবে যাওয়া যাবে, এএফডি–র জনসমর্থন ততই বেশি। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য গার্জিয়ান' যাকে বলেছে 'পূর্বের প্রতিশোধ'। জার্মান জনতার মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। সাবেক পূর্ব জার্মানিতে তা হয়তো খানিক বেশিই। স্বয়ং মার্কেলের নির্বাচনি কেন্দ্রেই প্রতি পাঁচজনের একজন ভোট দিয়েছেন এএফডি–কে। ওদিকে পোল্যান্ড আর চেক রিপাবলিকের ধার ঘেঁষে একেবারে পুবের তিন রাজ্যে এএফডি–র ভোট ৩৫ শতাংশের আশপাশে। ঘুমন্ত নিও–নাৎসি দৈত্যকে জাগিয়ে দিয়েছেন মার্কেলই, অতি দক্ষিণপন্থীদের এই বাড়বাড়ন্ত তাঁর শরণার্থী নীতির প্রতিরোধ হিসেবেই। তাই নিও–নাৎসিদের প্রভাব যদি আরও বাড়ে অদূর ভবিষ্যতে, ইতিহাস কিন্তু তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়ভারও চাপাবে মার্কেলের ঘাড়ে। মার্কেলই যেন বদলে দিতে চলেছেন পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে।

রবিন আলেকজান্ডারের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক থ্রিলার 'ডি গেট্রিবেনেন' পর্যালোচনা করেছে উদ্বাস্তুদের জন্যে মার্কেলের জার্মানির সীমান্ত খোলার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, কৌশলগত ভুল আর যোগাযোগের ব্যর্থতাকে। আলেকজান্ডারের চিত্রিত মার্কেল কিন্তু সন্ন্যাসিনী নন, নন খলনায়িকাও। তবু, উদ্বাস্তু সমস্যা জার্মান চ্যান্সেলারের সঙ্গে জার্মান জনতার সম্পর্ক বোধহয় বদলে দিয়েছে একেবারে। মার্কেল আর তাঁর শরণার্থী নীতি নিয়ে ভবিষ্যতে চলবে এমনই অজস্র বিশ্লেষণ আর পর্যালোচনা, এ একেবারে নিশ্চিত।

> নিও–নাৎসিদের প্রভাব যদি আরও বাড়ে অদূর ভবিষ্যতে, ইতিহাস কিন্তু তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়ভারও চাপাবে মার্কেলের ঘাড়ে। মার্কেলই যেন বদলে দিতে চলেছেন পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে।

জার্মানি, ইউরোপ, এমনকি গোটা পৃথিবীতেই অন্তত আরও কয়েক বছর থাকবে অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের প্রবল উপস্থিতি। জার্মান জনতা তাঁর ক্ষমতা খানিক খর্ব করে দিলেও, সে পথে ইউরোপ বা পৃথিবী কতটা বদলে গেল, সেটা তো নির্মীয়মাণ ইতিহাস। একদিকে ট্রাম্প, অন্যদিকে পুতিন, আর এর মাঝে ব্রেক্সিট–লাঞ্ছিত আপাত–বর্ণহীন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতৃত্ব মার্কেলের হাতেই থাকবে, নাকি তা বর্তাবে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ নামে এলিজে প্রাসাদের যুবক বাসিন্দার হাতে, তাও ভবিষ্যতের কথামালা।

শরণার্থী সমস্যার প্রেক্ষিতে 'টাইম' ম্যাগাজিন উদ্ধৃত করেছিল তাঁর উক্তি––'আমরা এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনি যে আলেপ্পো এবং মোসুল–এর ঘটনাবলি এসেন বা স্টুটগার্টকে প্রভাবিত করতে পারে। আমাদের এখন তার মুখোমুখি হতে হবে।' গত জার্মান নির্বাচনের ফলাফলকে 'বিল্ড' দৈনিক যতই বর্ণনা করুক না কেন 'মার্কেলের জন্যে দুঃস্বপ্নের জয়' হিসেবে, ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফরাসি কাব্যকথা আর শিনজো অ্যাবের জাপানি টাইফুন ছাপিয়েও ২০১৭টা ছিল অ্যাঞ্জেলা মার্কেলেরই। নোবেল শান্তি পুরস্কারটা না পেলেও ২০১৮–তে পেয়েছেন 'ল্যাম্প অফ পিস' পুরস্কার। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান খোঁজার স্বীকৃতি হিসেবে। তাঁর শরণার্থী নীতির ক্যাথলিক স্বীকৃতি।

অ্যাঞ্জেলা মার্কেলই যেন একুশ শতকের গ্রিমের রূপকথা!

(কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

appubabale@gmail.com

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

পুজো হোক পরিবেশবান্ধব

আবার এল দুর্গাপুজো, মণ্ডপে মণ্ডপে আলোর রোশনাই। হাজার হাজার ওয়াটের আলো ত্রিনয়নীর মুখে। কত রকমারি সাজ। আক্ষরিকভাবেই ভুবন মাতোয়ারা। উৎসবের অনুরণন একদিন মিলিয়ে যাবে, কিন্তু থেকে যায় কিছু যন্ত্রণা। শাড়ি, শ্যাম্পু ইত্যাদি নানা পণ্য নিয়ে পুজো কমিটিগুলির দেওয়া রাস্তায় রাস্তায় বিজ্ঞাপন সংবলিত ফ্লেক্স, ব্যানারের কোথায় 'পুনর্বাসন' হবে কেউ জানে না। পুজোর ফুল ও বিভিন্ন উপকরণ সহ সিসা ভরতি রংয়ে রঙিন প্রতিমা বিসর্জনের পর জলজ প্রাণীদের কী অবস্থা হবে বা জলের কী ক্ষতি হবে সেকথা ভাবার অনেকেরই সময় নেই। তার ওপর চরম দাহ্য পদার্থে ঠাসা মণ্ডপে কিছু অঘটন ঘটে গেলে তার কী হবে সেই উত্তরও অজানা।

পরিবেশ বাঁচলে আমরাও যে বাঁচব, তাৎক্ষণিক হিসাবে চট করে সে কথা মাথায় আসে না। আমাদের আনন্দের গ্লানি বহন করে বসুন্ধরা। এভাবেই পুজো আসে, পুজো যায়, আনন্দ উল্লাসে ঢাকা পড়ে যায় বসুধার ক্রন্দন। আমাদের সৃষ্ট বিষ ধারণ করে করে ধরা যে নীলকণ্ঠ, বড়ো ক্লান্ত। যেদিন এই ধরণী গরল ধারণ করার ক্ষমতা হারাবে সেদিন কী হবে ? আমরা কিন্তু সেই সর্বনাশের দিকেই ছুটে চলেছি। এখনও সময় আছে সচেতন হবার। তাই আসুন, আমরা সবাই 'পরিবেশ বান্ধব' পুজো করি আর তাতেই ভালো থাকবে এই বসুন্ধরা,ভালো থাকব আমরাও। আসুন বধ করি 'দূষণ'নামক অসুরটিকে আর এটাই হোক মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতি আমাদের সেরা অর্ঘ্য।

সুজনকুমার দাস, অধ্যাপক
শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ।

সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছে না

গত দুমাস যাবৎ শিশুশিক্ষাকেন্দ্র (SSK) এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের (MSK) হাজার হাজার শিক্ষক–শিক্ষিকা তাঁদের প্রাপ্য সাম্মানিকভাতা থেকে বঞ্চিত। এ ধরনের পরিস্থিতি যে নিত্য নতুন, তা নয়। আগেও দু একবার তাঁদের এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার কারণ আর যাই হোক, কোনো দৈব শক্তির প্রভাব নয়। ছোটো ছোটো কচি–কাঁচাদের সঙ্গে যাঁদের সংসার, তাঁদের পারিশ্রমিক তাঁরা সময়মতো পাবেন, এটা আশা করা যেতেই পারে। যে রাজ্যে ২৮,০০০ পুজো কমিটি সরকারি সাহায্য পায়, সেই রাজ্যে SSK ও MSK–এর শিক্ষক–শিক্ষিকাদের খাটুনির টাকাটা সঠিক সময়ে না পাওয়াটা সত্যিই দুঃখজনক। এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের পরিবার নির্ভরশীল এই সাম্মানিকের উপর। তাই মহালয়ার শুভ আগমনি বার্তা তাঁদের দেবী বন্দনায় কতটা মুখর করে তুলছে, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। যাই হোক, এই সমস্যার সমাধান যাতে দ্রুত হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ আশা করছি।

তড়িৎকুমার রায়
তালমাহাট, জলপাইগুড়ি।

রায়গঞ্জে চাঁদাসুর, জুলুম চলছে

দুর্গাপুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু এবার এই উৎসব রায়গঞ্জের মানুষের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রায়গঞ্জের বিভিন্ন রাস্তায় চলছে চাঁদার জুলুম। বাইক, চার চাকা গাড়ি থামিয়ে চাঁদা নিয়ে জোরজুলুম চলছে। টোটো চালকদের ওপর যে জুলুম চলছে, তা কহতব্য নয়।

এ বছর মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতায় সর্বজনীন পুজোর জন্য দান খয়রাতিও করা হবে। তারপরও এই জুলুম কেন ? নির্দিষ্ট করে কিছু ঘটনা তুলে ধরছি, বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে।

দেবীনগর ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে মহারাজা হাইস্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে অবর্ণনীয় চাঁদার জুলুম চলছে। এখানে লাঠি হাতে রাস্তায় নামা হয়েছে চাঁদা আদায় করতে, দেবীনগর বেলতলা মোড়ে একইরকম চাঁদার জুলুম টোটো চালকদের ওপর।

রায়গঞ্জ রেল স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় টোটো চালকরা চাঁদার জুলুমের শিকার। এছাড়াও অন্যত্রও চাঁদার জুলুমের খবর পাচ্ছি।

আমার প্রশ্ন রায়গঞ্জের পুলিশ প্রশাসন কি নিদ্রামগ্ন ? কেন নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে জুলুম বন্ধ করা হচ্ছে না ? পুলিশ কি এখানে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ?

মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করে শান্তি এনেছিলেন। রায়গঞ্জের পুলিশ কি মহিষাসুরের উত্তরসূরি চাঁদাসুরদের নিয়ন্ত্রণ করে শান্তি আনতে পারেন না?

সামিম আখতার বানু, রায়গঞ্জ।

পুজোয় যান নিয়ন্ত্রণ

'পুজোয় ৭ দিন শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক সংবাদ পড়ে অবাক লাগল। দুর্গাষষ্ঠী ১৫ অক্টোবর এবং বিজয়াদশমী ১৯অক্টোবর। কিন্তু যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে ১৪ থেকে ২০ অক্টোবর। গোটা শহরটাকে সুদীর্ঘ বারোঘণ্টা করে প্রতিদিন, সাতদিনের জন্য অবরুদ্ধ করে রাখার প্রয়াস আদৌ বাস্তবোচিত নয়। শহরে সন্ধ্যা ছয়টার আগে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও, নিষেধাজ্ঞা বহাল হয় বিকাল ৪টা থেকে। এছাড়া শহরের মূল রাস্তাগুলি–হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বর্ধমান রোড বা এসএফ রোড যথাসম্ভব সচল রাখার জন্য পুলিশকে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এইসব রাস্তায় প্রয়োজনে রাত নয়টার পর যান নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সাধারণ কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও পুজোর সময় মানুষজনের রেলস্টেশন, বিমানবন্দরে যাতায়াতের প্রয়োজনের কথা বিন্দুমাত্র ভাবা হয় না, উপেক্ষিত মানুষের আকস্মিক বিপদ বা চিকিৎসার প্রয়োজনে গাড়ি ব্যবহারও। সবকিছু বন্ধ করে রাখার নেতিবাচক মনোভাব নিঃসন্দেহে নাগরিক পরিসেবার পরিপন্থী, অথচ এ ধরনের বহর উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

আর, প্রতিবছর পুজোর সময় যে গাইডম্যাপ দেওয়া হয় তা সাধারণের কাছে আদৌ পৌঁছায় না। এ প্রথা বন্ধ হোক এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হোক। পরিশেষে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ধন্যবাদ, এই বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য।

অশোক রায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

পুজোর আনন্দ নিক ওরাও

দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করার পর মা আসছেন মর্ত্যে। চারিদিকে সাজো সাজো রব। মা দুর্গাকে বরণ করার কত আড়ম্বর। সাধারণ মানুষ থেকে পুজো উদ্যোক্তা সবাই ব্যস্ত প্রতিযোগিতায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা আর প্রতিমা তৈরিতে। শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জনের দৌড়। অথচ কত অসহায় মানুষ, অনাথ শিশু আমাদের চারপাশে।

যারা একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। মাথার উপরে ছাদ নেই। মা কোথায় জানে না। বাবাকে দেখেনি কখনও। ফুটপাথ, রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাস, যেখানে মশা–মাছিতে ভনভন,সেই পরিবেশে ওদের আস্তানা। দিনরাত খাবারের চিন্তায় শৈশব পুড়ে ছাই। কিন্তু পুজো এলে ওদের মুখে হাসি ফোটে। কেউ তো আসবে ওদের জন্য কিছু নিয়ে সেই আশায়।

আসুন না পুজোর কদিন আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ওদের পাশে দাঁড়াই। পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা তাঁদের বাজেটে কাটছাঁট করে এগিয়ে আসুন সেই অসহায় অনাথদের পাশে।

আমরা পুজোর আনন্দ কিছুটা ভাগ করে নিই ওদের সঙ্গে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে ওরাও মেতে উঠুক।

নূপুর রায়
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

ঢাকিদের কথা

শরৎ মানে প্রকৃতিতে যেমন কাশফুলের সমারোহ, শরৎ মানে আকাশে নীলাভ মেঘের ঘনঘটা, আর শরৎ মানেই দেবীর আগমনির সুর। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। যেন ক্যালেন্ডারের পাতায় প্রতীক্ষার কয়েকটি দিন গোনা। আমরা বাঙালিরা একটু বেশিই আবেগবিহ্বল। আজ চারিদিকে পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। বিভিন্ন ক্লাব উদ্যোক্তারা নেমে পড়েছেন প্রস্তুতিতে। তাদের ভাবনা বা আয়োজন জেলায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাবে, এটাই তাদের লক্ষ্য। পুজো মানে সত্যিই সকলের মনে আনন্দের স্রোত বয়ে যাওয়া যেন কতদিনের প্রত্যাশার পূরণ। পুজোর আনন্দ ঢাকিদেরও মুখে ফোটায় হাসি। তাঁরাও করজোড়ে বলেন, এই তো মা আসছেন। সারাটি বছর তাঁরা প্রতীক্ষায় থাকেন এই বিশেষ দিনগুলির জন্যে। ঢাকিপাড়ার নিস্তব্ধতা সাময়িক কেটে যায় পুজোর দিনগুলোতে। কারণ পুজোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব উদ্যোক্তারা ঢাকিদের বায়না করে। পঞ্চমীর দিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত পুজো প্যান্ডেলে চলে তাঁদের ঢাক বাজানো। তাই পুজো মানেই তাঁদের উর্পাজনের কিছুটা পথ খোলা। পুজোর অতিরিক্ত রোজগারের আশায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন কোনো কোনো ঢাকি। এ সময়ে তাঁরা কিছু বাড়তি আয়ের স্বপ্ন দেখেন।

শংকর সাহা
পতিরাম বাজার, দক্ষিণ দিনাজপুর।

প্যাঁচফোড়ন

দুর্গা ২০১৮

উত্তরায়ণ দেব

'তব অচিন্ত্য রূপ–চরিত–মহিমা, তব অচিন্ত্য' ! উঠছি উঠব করে কুয়াশার পাতলা চাদরে শরীর ঢেকে প্রভাতী আলো যখন আলস্যে মগ্ন, বাল্য অভ্যাসের রেডিয়ো যন্ত্রে মহিষাসুরমর্দিনীর সুর মূর্ছনায়, এই পেঁচুয়ার দুটো চোখ নেশাতুর আবেশে কখন যেন পুনরায় বন্ধ হয়ে এসেছিল।

অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে এয়ারবাসটি এয়ারপোর্টের মাটি ছুঁতেই ঈশা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাত্র কিছুদিন তো নয়, পুরো একটা বছর পার করে পুজোর ছুটির কটা দিন মা–বাপের সান্নিধ্য। ফেলে যাওয়া অতীতের পরিমণ্ডলে কিছুদিনের জন্য হলেও শৈশবকে ছুঁতে পাওয়ার এ এক অনন্য অনুভূতি। ভাগ্যিস সমস্ত অনুভূতি ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না ! নইলে এর অনুরণনটাই হয়তো ফিকে হয়ে যেত। বড়ো হলে কিংবা বিয়ে হলেই বুঝি নাড়ির টান অত সহজে ছিঁড়ে দেওয়া যায় ! কখনওই নয়। কর্পোরেটে উচ্চপদে কর্মরতা ঈশার বিমান অফিস টুরে এভাবেই বছরে একাধিকবার মাটি ছোঁয়, কিন্তু আজকের মাটি ছোঁয়াটায় কেন অন্য শিহরণ এনে দিচ্ছে শরীরে, মনে ! এর হয়তো কোনো উত্তর হয় না। উত্তর ঈশাও চায় না। ও শুধু চায় হাতঘড়ির কাঁটাটাকে থামিয়ে কয়েকটা দিন নিজেকে রি–চার্জ করে নিতে, যা দিয়ে বছরের বাকি দিনগুলি কেটে যায়। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই ঈশা প্রি –পেইড ট্যাক্সিতে ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে চেপে বসে। উফ্ আর মাত্র ঘণ্টা খানেক। হাইওয়ে ছেড়ে সবুজ খেতটার বুক চিরে ট্যাক্সিটা যখন ক্রমশ নগর জীবনটাকে ছেড়ে যাচ্ছিল, ঈশাও যেন ছেলেবেলার খুব চেনা গাঁয়ের গন্ধটা বাতাসে টের পাচ্ছিল।

মায়ের চশমার পাওয়ারটা বেড়েছে। বাবার বন্ধ ফ্যাক্টরিটা আজও খোলেনি। প্রতি মাসে ঈশার পাঠানো টাকাতেই সংসারটা টিকে আছে। এই ব্যাপারে ঈশার বাবার প্রবল আপত্তি ঈশা কখনও কানে তোলেনি। কারণ ও মনে করে একটি ছেলে স্বাবলম্বী হয়ে যদি বৃদ্ধ মা–বাবার দায়দায়িত্ব পালনের অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে একটি রোজগেরে মেয়েরও সেই স্বাধীনতাটুকু থাকা উচিত। মাসের শুরুতে ভিডিয়ো কলে অসহায় মা–বাবার মুখের অমূল্য হাসিটুকুই ঈশার প্রতিমাসের সেভিংস। সব সঞ্চয় কি আর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নজরে আসে! ঈশার কড়া নির্দেশে ছেলেমেয়েগুলো গ্রামের মাটির পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ঈশা বুঝতে পারে কোথাও যেন ছন্দ কেটে গেছে। ওর মেয়েবেলার সাথি অবিবাহিতা নিরঞ্জনাকে নাকি কয়েক মাস ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঋণের দায়ে প্রতিবেশী কৃষক পরান কাকা একদিন ফলিডল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। এদিকে মা–বাবার মুখের হাসিতেও কেমন দুশ্চিন্তার মেঘ। ভাইটার চাকরির জন্য ঈশার পাঠানো থোক টাকাটা পার্টির এক নেতা গিলে বসে আছে। নিরুপায় হয়ে কাজের সন্ধানে ভাই শহরের মেসে থাকে। কিছুদিন আগে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনাটার রাজনৈতিক ঢেউয়ে পার্টির কিছু ছেলেকে আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে। ভাইটার নাম কিভাবে ঘটনায় জড়িয়ে গিয়েছে। তাই ঈশার সঙ্গে এবারে তার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। ভাইয়ের পুজোর জামা কাপড়গুলো মায়ের হাতে তুলে দিতেই মা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঈশা মাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সত্যিই কি এই অবস্থায় কোনো সান্ত্বনা হয়?

অষ্টমীর রাতে বাবার হাঁফের দমকাটা আচমকা বাড়তেই, শাড়িটা বদলে বাচ্চাদের ঘরে রেখে বড়ো রাস্তার ধারে ওষুধের দোকানের উদ্দেশে ঈশা পা বাড়ায়। আলো–আঁধারি পথটায় টর্চের আলো ফেলে ঈশা দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। দূর থেকে মণ্ডপের ঢাকের আওয়াজ আসছে। যাওয়ার পথে পার্টি অফিসটার আলো ঈশাকে সাহস যোগায়, তবে অফিসটা পোড়াবার সময় বাতাসে ভেসে আসা মিষ্টি গন্ধটা ঈশা চিনতে পারে। ইনহেলার কিনে নিয়ে ফিরতি পথে পার্টি অফিসের আলোটা ছাড়াতেই আচমকা পেছনে দুপাশ থেকে ঈশার দুটো হাত টেনে ধরে, ঈশা চমকে ঘুরে তাকাতেই একটা ফ্ল্যাগ দিয়ে ঈশার মুখটা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে পার্টি অফিসে এনে ঈশাকে মাটিতে শুইয়ে একের পর এক ছেলেগুলো...... ! কয়েকটা মুখ ঈশা চিনে ফেলাটাই ওর জন্য কাল হয়।

পোস্ট মর্টেম আর মিডিয়ার ঘেরা বন্দিতে নবমীটা কাটিয়ে, শেষে শ্মশানের ঢাল গড়িয়ে নেমে জল প্রবাহে ঈশা যখন ছাই হয়ে ভেসে যাচ্ছিল, নদীর অপর প্রান্ত থেকে দশমীর ভাসানের ঢেউ এসে ঈশাকে দুলিয়ে দিচ্ছিল বারবার।